# পড়া আর শেখা

পরদিন ক্লাসে আগের দিনের পথের গল্প হলো। সব শুনে স্যার বললেন — রুবির দাদু প্রকৃত শিক্ষিত মানুষ। উনি নানা পদ্ধতিতে শিখেছেন। শুধু বই পড়ে শেখেননি। ওঁর শেখায় পড়ার সঙ্গে বাস্তবের যোগ হয়েছে। শিক্ষা সার্থক হয়েছে।

নাসরিন বলল — শুধু বই পড়লে ভালো শিক্ষা হয় না?

— পড়ার সঙ্গে অনেক কাজ করার কথা বইতেই রয়েছে। সেগুলো করতে হবে। কী করছ তা লিখতে হবে। এমন করতে করতেই শিক্ষার সঙ্গে বাস্তবের যোগ হবে।

আয়ুব বলল— স্যার, যখন বই ছিল না, লোকে কীভাবে পড়ত?

— তখন পড়ার বদলে শোনায় জোর পড়ত। শুনে শুনে মনে রাখতে হতো। আর মুখে মুখে আলোচনা হতো। তারপর একসময় লেখা শুরু হলো। প্রথমে একরকম গাছের কান্ডের ছিলা শুকিয়ে তার উপরে লেখা হতো। কোথাও কোথাও সেই গাছের ছিলাটাকে প্যাপিরাস বলতো। সেই

থেকেই কাগজের ইংরাজি নাম পেপার হয়েছে।

রুবি বলল— কাগজ কবে এল স্যার?

— কাগজ এসেছে অনেক পরে। চিন দেশে প্রথম কাজ তৈরি করা হয়। আমাদের দেশে তালপাতায়ও অনেকে লিখে রাখতেন। এই তালপাতায় লেখা বইগুলিকে *পুথি* বলা হয়। তবে শুধু পুথি বা বই পড়ে মানুষ সব শিখত না। রোজকার হাতেকলমে কাজের মধ্যে দিয়েও শিখত। বইতে লেখা কথা যাচাই করে নিত। রুবির দাদুও সেভাবেই বইয়ের পড়াকে হাতেকলমে যাচাই করে শিখেছেন।

— রুবির দাদুর শিক্ষায় সেভাবেই বাস্তবের যোগ হয়েছে?

— ওঁর বইতে হয়তো তা ছিল না। তবে উনি খুব গরিব ছিলেন। পরিস্থিতি ওঁকে বাস্তবের কাছে ঠেলেছিল।

— বাড়িতে আমাকে বলে, অন্য কিছু করতে হবে না। ভালো করে লেখাপড়া করো।

— এটা ঠিক নয়। শেখার বিষয়ের একটা অংশমাত্র বইতে থাকে।

অজিত বলল — স্যার কত অংশ বইতে থাকে?

— সেটা বলা যায় না। সব বই একরকম নয়। আবার কিছুটা বই ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। তোমরা গত নয়-দশ মাস কীভাবে বই ব্যবহার করছ? যত বিষয়ে আলোচনা করার কথা বলা হয়েছে তা করেছ? তা করে লিখেছ?

কয়েকজন হাত তুলল। কেউ কেউ বলল— হ্যাঁ করেছি।

স্যার আবার বললেন— যেসব বিষয়ে পরীক্ষা করতে বলা হয়েছে, সেগুলো করেছ?

আবার কয়েকজন হাত তুলল।

স্যার এবার বললেন— বইতে করতে বলা হয়নি এমন কী কী কাজ করেছ?

স্বপ্না বলল— শুধু ধানখেত নয়, আমবাগানের আর উইঢিবির মাটি গুঁড়ো করে পরীক্ষা করেছি।

সিরাজ বলল— আমি পুকুরের পাড়ের মাটি আর জলের নীচের পাঁক নিয়ে পরীক্ষা করেছি।

এই তো চাই। বইতে যা বলা আছে তা করলে শেখা শুরু হবে। তখন দেখতে পাবে শেখার আরও কত কী আছে!

## বলাবলি করে লেখো

তুমি কীভাবে শিক্ষার সঙ্গে বাস্তবের যোগ ঘটানোর চেষ্টা করছ? ভেবে লেখো :

| | |
|---|---|
| সংসারের কী কী কাজ তুমি করো | |
| পরিবারের আয়ের জন্য অন্য কারো কাজ করতে হয়? হলে কী করো | |
| বইতে যেসব কাজ করার কথা পেয়েছ তার মধ্যে কতগুলো করেছ | |
| এসব কাজ করতে কেমন লেগেছে | |

# গীতালির সাইকেল

ক্লাসে এসে স্যার রোজই সবাইকে একবার দেখে নেন। এদিনও তাই দেখছিলেন। মনে হলো, গীতালির মুখটা থমথমে। এমনিতে ক্লাসে বিশেষ কথা বলে না। কিন্তু হাসিখুশি থাকে। কোনো কারণে দুঃখ পেয়েছে। স্যার ওর দিকে হয়তো একটু বেশিক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন।

গীতালি উঠে দাঁড়িয়ে বলল— স্যার বাড়ির কাজ করলে কেউ ভালো বলে না। বরং বাইরের কাজ করাই ভালো।

আরো দু-চার কথার পরে ব্যাপারটা বোঝা গেল। ওর দাদা রতন। ক্লাস নাইন পর্যন্ত স্কুলে আসত। বছর দুই

হলো আসে না। শিবু জেঠার কাঠগোলায় কাজে ঢুকেছে। ওখানকার নিয়ম প্রথম ছ-মাস কাজ শিখবে। মাইনে পাবে না। কিছুটা শিখতে পারলে তারপর থেকে মাইনে দেবে। এক বছর পেরিয়ে গেল। কিন্তু এখনও কাজ শেখেনি। মাইনে পায় না। বাড়ি থেকে আধ কিলোমিটার দূরে যাবে। অথচ সাইকেলটা নিয়ে যাবে। সে ন-টায় ঘুম থেকে উঠে টিফিন খেয়ে চলে যাবে। গীতালি ঘরের সব কাজ করবে। তারপর দেড় কিলেমিটার হেঁটে স্কুলে আসবে ।

স্যার বুঝলেন সমস্যাটা।

বলে ফেললেন— তোমার মা বাড়িতে থাকেন না?

— মা কাজে যান।

স্যার ভাবলেন, ওর একটা সাইকেল দরকার। তাই বললেন— এতটা রাস্তা হেঁটে আসতেই তোমার কষ্ট, তাই না?

— আমার স্কুল দূরে। তাই সাইকেলটা দাদু আমাকেই দিয়েছে। তাতেই দাদার রাগ! তাই মা বলেছিল, এখন

দাদা নিক। দাদা মাইনে পেলে তাকে সাইকেল কিনে দেব। তখন তুমি নেবে তোমার সাইকেলটা। কিন্তু দাদা তো মন দিয়ে কাজ শিখছেই না। মাইনে পাবে কী?

স্যার আবার একটু ভাবলেন। তারপর বললেন— আগের অভিভাবক সভায় কে এসেছিলেন? তোমার মা, নাকি বাবা?

গীতালি মাটির দিকে তাকিয়ে বলল— কেউ আসেননি।

— পরেরবার তোমার মাকে আসতে বলো। আমি ওঁকে বুঝিয়ে বলব।

## বলাবলি করে লেখো

গীতালি ও রতনের সমস্যার মতো অনেক সমস্যা চারপাশে দেখা যায়। তুমি এমন যে সমস্যা দেখেছ তা নিয়ে লেখো:

| সমান পরিমাণ খাদ্য | পড়াশুনা | খেলাধুলা | অন্যান্য সুযোগ সুবিধা |
|---|---|---|---|
| | | | |

# প্রাকৃতিক দুর্যোগ : সুনামি, আয়লা

স্কুল থেকে ফেরার পথে গীতালি বলল— অনেক সময় জোরে ঝড় আসে। সে ব্যাপারে কীভাবে সাবধান হওয়া যায়?

অজিত বলল— ঝড় বন্ধ করা যায় না। তবে যেখানে ঝড় বেশি হবে সেখান থেকে সরে যাওয়া যায়।

— কোথায় ঝড় বেশি হবে কী করে বুঝব?

— গাছপালা ঝড়ের ধাক্কা অনেকটা সামলে দেয়। কিন্তু সমুদ্র তো পুরো ফাঁকা। জোরে ঝড় আসে। কোনো বাধা

পায় না। তাই ঝড়ের সম্ভাবনা থাকলে সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া যাবে না। রেডিয়োতে বলে দেয়।

—সমুদ্রের ধারে যারা থাকেন?

নাসরিন বলল— তাঁদেরও সাবধান হতে হয়। সমুদ্রের ধার থেকে যতটা সম্ভব সরে আসতে হয়।

সুনীল বলল— বাড়িঘর ফেলে আসবেন?

— আগে তো মানুষ নিজেদের প্রাণ বাঁচাবে। ২০০৯ সালে খুব ঝড় হয়েছিল। তার নাম আয়লা। আমার মাসিরা সুন্দরবনে থাকে। বাড়িঘর সব ভেঙে গিয়েছিল। তারপর আবার ছোটো বাড়ি করেছেন।

— আবার তো ঝড় আসতে পারে। আবার বাড়ি ভেঙে যেতে পারে।

— এবার পোক্ত করে ভিত দিয়েছে। একতলা বাড়ি করেছে। দোতলা-তিনতলা হলে বেশি ঝড় লাগে। ক্ষতি বেশি হয়।

পরদিন ক্লাসে সবাই মিলে এসব বলল। স্যার বললেন—

ঝড়ের ব্যাপারটা তোমরা বেশ বুঝেছ। ২০০৪ সালে সুনামি হয়েছিল। সেটা ছিল সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস। সমুদ্রের ধারের লোকদের খুব ক্ষতি হয়েছিল।

অরূপ বলল— শুনেছি স্যার। সমুদ্রের জল উঠে এসেছিল। আমরা টিভিতে দেখেছি। উঁচু হয়ে জল ছুটে আসছে। সেবারেও অনেক ক্ষতি হয়েছিল।

— আসলে সমুদ্রের নীচে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়েছিল। আমাদের রাজ্যে তেমন মারাত্মক ক্ষতি হয়নি। কিন্তু দক্ষিণে তামিলনাড়ুর দিকে প্রচুর ক্ষতি হয়েছিল। কোথাও তিনমিটার, কোথাও বারোমিটার উঁচুতে জল উঠে গিয়েছিল।

— তিন মিটার মানে একতলা বাড়ির ছাদ। আর বারো মিটার মানে তো চারতলা বাড়ির ছাদ!

## বলাবলি করে লেখো

সুনামি ও আয়লা বিষয়ে বড়োদের সঙ্গে কথা বলো। তারপর নিজেরা আলোচনা করে লেখো :

| | |
|---|---|
| পশ্চিমবঙ্গে সুনামিতে কী দেখা গিয়েছিল | |
| দক্ষিণ ও পূর্বের রাজ্যে সুনামিতে কী দেখা গিয়েছিল | |
| সুন্দরবনের দিকে আয়লায় কী হয়েছিল | |
| পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র আয়লায় কী হয়েছিল | |

# প্রাকৃতিক দুর্যোগ : ভূমিকম্প এবং হড়পা বান

সমুদ্রের নীচে ভূমিকম্প? এই কথাটা বুঝতে পারল না সুনীল। রাস্তায় গিয়ে অরূপকে বলল—সমুদ্রে তো জল থাকে। ভূমি মানে তো মাটি। ভূমিকম্প কী করে হবে রে?

— জল তো কয়েক কিলোমিটার গভীর। তার নীচে তো মাটি কিংবা বালি আছে। নয়তো পাথর আছে। সেইগুলোই ওলটপালট হয়ে যায়। ভূমিকম্প শুরু হয় আরও গভীরে।

— ভূমিকম্প তো বন্ধ করা যাবে না?

আকাশ বলল--- তাই যেখানে বেশি ভূমিকম্প হয় সেখানকার মানুষ কাঠের বাড়িতে থাকে। কাঠের বাড়ি ভাঙে কম। ভাঙলেও ঘরের জিনিসপত্র ভাঙার সম্ভাবনা কম। জীবনহানির সম্ভাবনা কম। ওই কাঠ দিয়ে আবার নতুন বাড়িও বানানো যায়।

অজিত বলল — আমাদের এদিকে তো কাঠের বাড়ি নয়। যদি জোরে ভূমিকম্প হয়?

— ফাঁকা জায়গায় চলে যেতে হবে। সময় না পেলে টেবিলের নীচে বা খাটের নীচে ঢুকে পড়তে হবে।

অজিত বলল — বুঝেছি! দেয়াল ভেঙে পড়লে প্রথম ধাক্কাটা কাঠের উপর দিয়ে যাক!

পরদিন ক্লাসে সবাই মিলে স্যারকে এসব বলল। তারপর গীতালি বলল — আর কী প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়?

স্যার বললেন— বন্যার কথা তো সবাই জানো। অনেক জায়গায় এমনিতে বন্যা হয় না।পাহাড়ি জায়গা বা পর্বতের কাছের অঞ্চল। সেখানে হঠাৎ বন্যা হয়ে যায়। আচমকা বন্যায় লোকেরা খুব বিপদে পড়ে।

— কীভাবে? জল তো নদী দিয়ে নীচের দিকে চলে যাবে!

— আসলে নদীগুলো নুড়ি-পাথর জমে ভরাট হয়ে গেছে। হঠাৎ খুব বৃষ্টি হলে অনেক জল আসে নদীতে। অত জল নদী দিয়ে বয়ে যেতে পারে না। বন্যা হয়ে যায়। একে বলে হড়পা বান। গত কয়েক বছরের মধ্যে পুরুলিয়ায়, জলপাইগুড়ি আর উত্তরখণ্ডে এমন হয়েছে।

## বলাবলি করে লেখো

ভূমিকম্প ও বন্যার ঘটনা বিষয়ে বড়োদের সঙ্গে কথা বলো। তারপর নিজেরা আলোচনা করে লেখো :

| ভূমিকম্পের সময়ে কী কী সাবধানতা নেওয়া দরকার | ভূমিকম্পে কী কী ক্ষতি হতে পারে | বন্যায় কী কী ক্ষতি হয় | বন্যার সময়ে কীভাবে সাবধানতা নেওয়া দরকার |
|---|---|---|---|
| | | | |

# পূর্বাভাস

গীতালি বলল— ঝড়-বৃষ্টির কথা আরও আগে বলা যায় না?

স্যার একটু ভেবে বললেন— আরও আগে আবহাওয়ার পূর্বাভাসের কথা বলছ!

— আবহাওয়া মানে? পূর্বাভাস মানে?

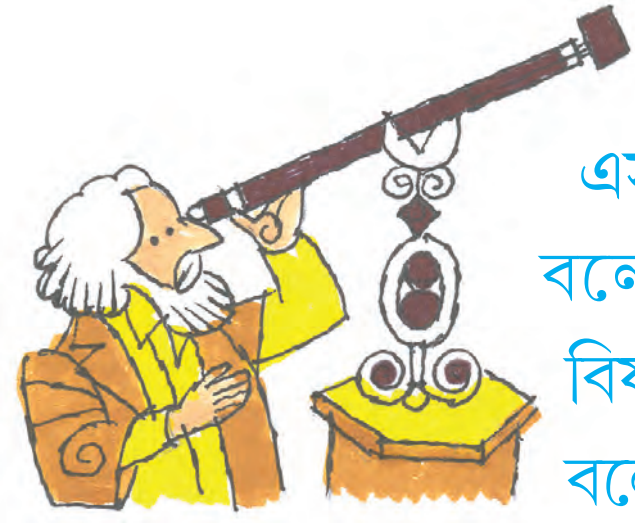

--- ঝড়-বৃষ্টি, বাতাসের ঠাণ্ডা-গরম, হাওয়ার গতি— এসবের আবস্থাকে একসঙ্গে বলে আবহাওয়া। আর সেসব বিষয়ে আগে থেকে জানানোকে বলে পূর্বাভাস। খবরের কাগজ, রেডিও, টেলিভিশন ও ইন্টারনেটে দেখবে এমন পূর্বাভাস দেওয়া হয়। পরিবেশ দূষণের ফলে আবহাওয়া বদলে যাচ্ছে। বৃষ্টির ধরন বদলাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা এসব বোঝার

চেষ্টা করছেন। এই বিষয়টাকে বলে আবহাওয়া-বিজ্ঞান। এই বিষয়ের গবেষণা এখনও খুব নিখুঁত হয়নি। তাই ঝড়-বৃষ্টির কথা খুব বেশি আগে বলা যায় না। তবে সুনামি কবে হবে তা আগে থেকে জানা যায়।

নাসরিন বলল— সূর্যগ্রহণ-চন্দ্রগ্রহণের কথা অনেক আগে বোঝা যায়?

—এই বিষয়ের গবেষণা খুব উন্নত। কয়েক হাজার বছর আগে থেকে মানুষ আকাশ দেখছে। প্রায় পাঁচশো বছর আগে গ্যালিলিও গ্যালিলি টেলিস্কোপ তৈরি করেন। তারপর আকাশ দেখা উন্নত হয়। এখন আরও উন্নত। তাই এসব এত ভালো করে বলা যায়।

— পরিবেশ দূষণের জন্য সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণের দিন বদলায় না?

— না। চাঁদ-সূর্য অনেক দূরে আছে। পৃথিবী থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটারের পর আর বাতাস নেই। চাঁদ আছে

পৃথিবী থেকে প্রায় চার লক্ষ কিলোমিটার দূরে। আর সূর্য তার তুলনায় প্রায় চারশো গুণ বেশি দূরে। তাই সূর্য বা চাঁদের উপর পৃথিবীর পরিবেশের প্রভাব নেই।

## বলাবলি করে লেখো

প্রাকৃতিক দুর্যোগের কিছু পূর্বাভাস মেলে, কিছু মেলে না। তোমার জানা এমন কয়েকটা ঘটনার কথা লেখো :

| কী ধরনের দুর্যোগ | কবে হবে বলে পূর্বাভাস ছিল | কবে হয়েছিল | পূর্বাভাস পাওয়ায় ক্ষতি কতটা কমেছিল |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# মেঘের ছায়া, চাঁদের ছায়া ঃ দিনদুপুরে সূর্য ঢাকা

দুপুর বেলা। বেশ রোদ। হাঁটছিল আশা। সামনে একটা মেঘের ছায়া। মেঘটা ভেসে যাচ্ছে। ছায়াটাও সরে যাচ্ছে। আশা ভাবল, মেঘ ছাড়া অন্য কিছু কি দিনের সূর্যকে আড়াল করতে পারে?

ক্লাসে গিয়ে দিদিমণির কাছে জানতে চাইল।

সূর্যগ্রহণের ছবি আঁকো

দিদি বললেন— সূর্য আর পৃথিবীর মাঝে কী আসতে পারে? দুয়ের মাঝে আছে, রোজ একটু করে সরে যায়।

চাঁদনি বলল— চাঁদ?

— ঠিক বলেছ। সূর্যকে চাঁদ আড়াল করতে পারে। তেমন একটা ছবি আঁকো তো।

চাঁদনি ছবি আঁকল। চাঁদ রয়েছে সূর্য আর পৃথিবীর মাঝে। চাঁদের ছায়া পড়েছে পৃথিবীর খানিকটা অংশে।

দিদি বললেন— পৃথিবীর ওই জায়গার লোকেরা সূর্য দেখতে পাবে না।

এমিলি বলল— চাঁদটা যতক্ষণ ওখানে থাকবে, সূর্য আড়ালে পড়ে যাবে।

— যারা এমন দেখবে তারা বলবে **সূর্যগ্রহণ** হয়েছে।

আশা বলল — দিদি, বাড়িতে গিয়ে সূর্যগ্রহণের ছবি আঁকব?

— হ্যাঁ, সবাই আঁকবে।

# পুরো ঢাকা, খানিক ঢাকা : পূর্ণগ্রহণ, খণ্ডগ্রহণ

বাড়ি এসে মুজিবর সূর্যগ্রহণের ছবি আঁকল। কিন্তু ছায়াটা পৃথিবীর পাশে রয়ে গেল। কেন এমন হলো? ভালো করে ছবিটা দেখে বুঝল যে চাঁদটা পাশে আঁকা হয়ে গেছে। একটু সরিয়ে আঁকলে ছায়াটা পৃথিবীর উপর পড়ত।

১)

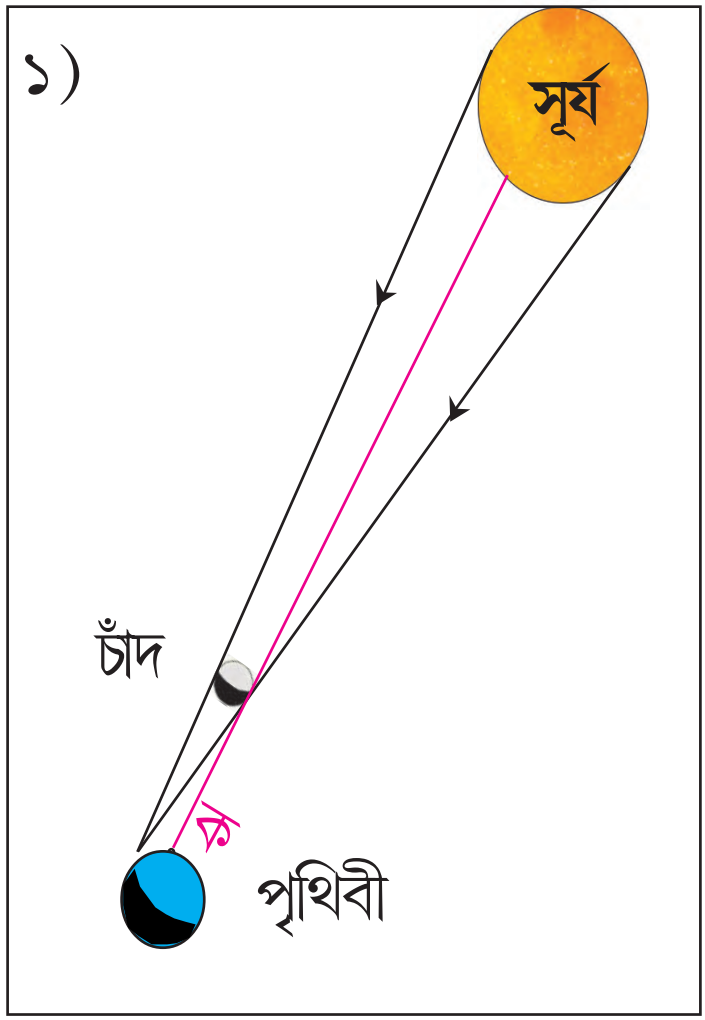


স্কুলে ওর ছবিটা সবাইকে দেখাল। দিদিমণি বললেন—

ধরো, পৃথিবীর উপর ক বিন্দুতে কেউ আছে। ক বিন্দু থেকে চাঁদ ঘেঁসে আমি একটা দাগ দিচ্ছি। (১নং ছবি)

এই বলে দিদি একটা দাগ দিলেন। দাগটার বাঁদিকে সূর্যের একটা অংশ রইল।

সবাই বুঝল— সূর্যের ওই অংশটা চাঁদের আড়ালে পড়বে। দেখা যাবে না। কিন্তু ডান দিক থেকে সূর্যের আলো ক বিন্দুতে আসবে।

আশা বলল— দিদি, সূর্যের খানিকটা দেখা যাবে।

— ঠিক বলেছ। ক বিন্দু থেকে সূর্যের খানিকটা দেখা যাবে।

— পৃথিবীতে ক বিন্দুর বাঁদিকে যারা থাকবে তারা সূর্যের আরো কম অংশ দেখবে।

— ঠিক। এরা সবাই খণ্ডগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখবে।

চাঁদনি এবার আগের দিনের মতো একটা ছবি এঁকে বলল— এই ছবিতে যে সূর্যগ্রহণ দেখেছিলাম সেটার কী নাম?

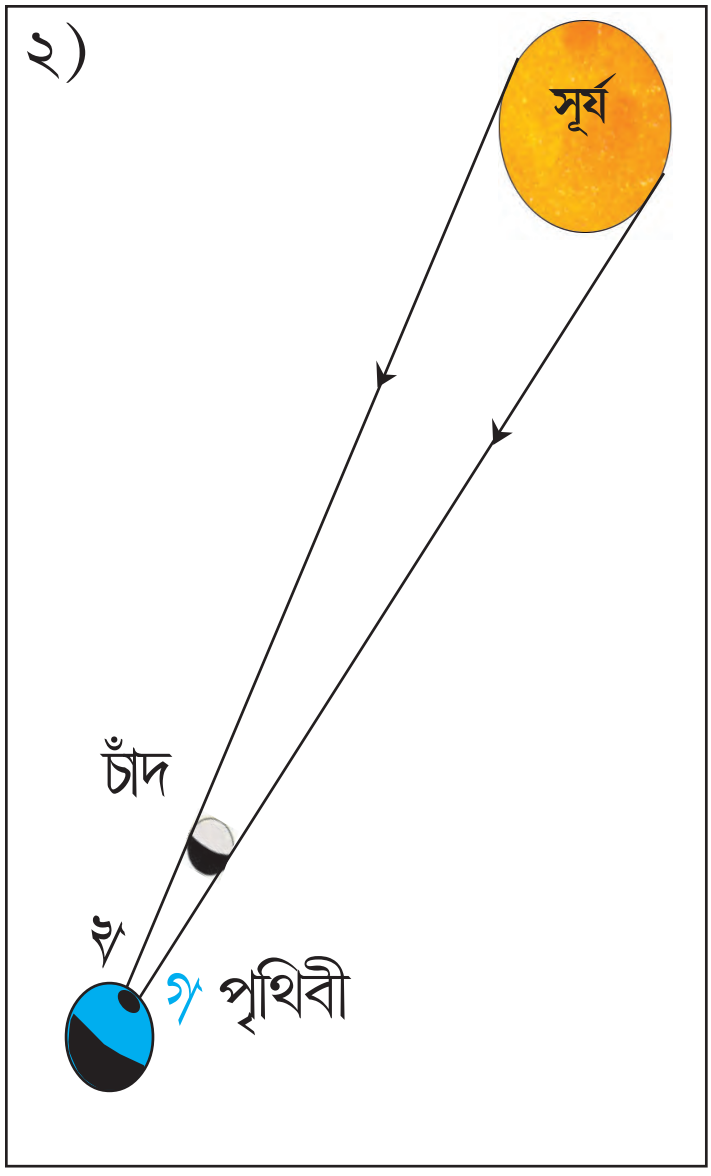


ওই ছবিতে দিদি পৃথিবীর উপর দুটো বিন্দু দেখালেন, খ আর গ। (২নং ছবি)

বললেন— খ থেকে গ-এর মধ্যে থাকলে সূর্য পুরোটাই আড়ালে পড়বে। তাই ওই দুই বিন্দুর মাঝে যারা থাকবে তারা পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখবে।

তারপর দিদি পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের আর একটা ছবি আঁকলেন। সেখানে গ-এর ডান দিকে আর একটা বিন্দু ঘ দেখিয়ে বললেন — ঘ-তে থাকলে কী দেখবে? (৩নং ছবি)

৩)

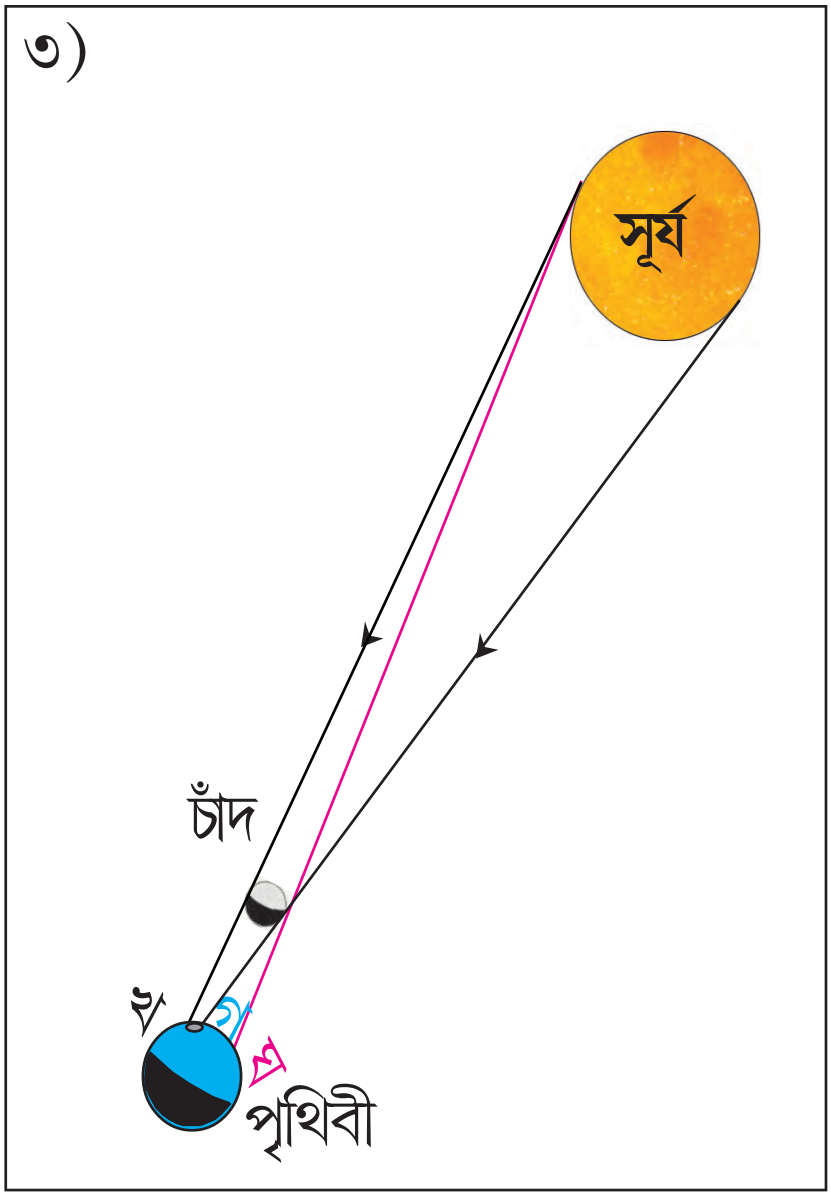


আশা বলল— একটা দাগ দিয়ে দেখব?

— নিশ্চয়ই।

আশা ঘ বিন্দু থেকে চাঁদের গা ঘেসে স্কেল ধরে দাগ দিল। দাগটা সূর্যের পাশ দিয়ে চলে গেল। বাশার বলল— বুঝেছি। ঘ বিন্দু থেকে সূর্যের পুরোটাই দেখা যাবে।

আশা বলল— তাহলে ঘ বিন্দু থেকে সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে না।

— ঠিক বলেছ। সূর্যগ্রহণের দিন তিনরকম ঘটনা ঘটতে পারে।

বাশার বলল— পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ, খণ্ডগ্রাস সূর্যগ্রহণ অথবা কোনো গ্রহণই নয়।

মুজিবর বলল— সূর্য আর পৃথিবীর মাঝে চাঁদ থাকলে কখন গ্রহণ হবে তা এঁকে দেখব?

— এখন এঁকেই দেখো। যখন সূর্যগ্রহণ হবে তখন সত্যি সত্যি কেমন দেখায় তা দেখবে। তবে সূর্যের দিকে খালি চোখে তাকাবে না। অতিবেগুনি রশ্মি চোখে পড়তে পারে। ওই রশ্মি চোখের পক্ষে ক্ষতিকর। একরকম চশমা পাওয়া যায়। সেটা অতিবেগুনি রশ্মি আটকে দেয়। ওই চশমা পরে সূর্যগ্রহণ দেখবে।

# সূর্যগ্রহণ: কোথায় কেমন? নিজে আঁকো। বুঝে নাও:

কোথায় পূর্ণগ্রহণ, কোথায় খণ্ডগ্রহণ, কোথায় গ্রহণ নয়? স্কেল ধরে লাইন টেনে দেখাও। লেখো:

| | |
|---|---|
| ক বিন্দুতে | |
| খ বিন্দুতে | |
| গ বিন্দুতে | |
| ঘ বিন্দুতে | |

# চন্দ্রগ্রহণ

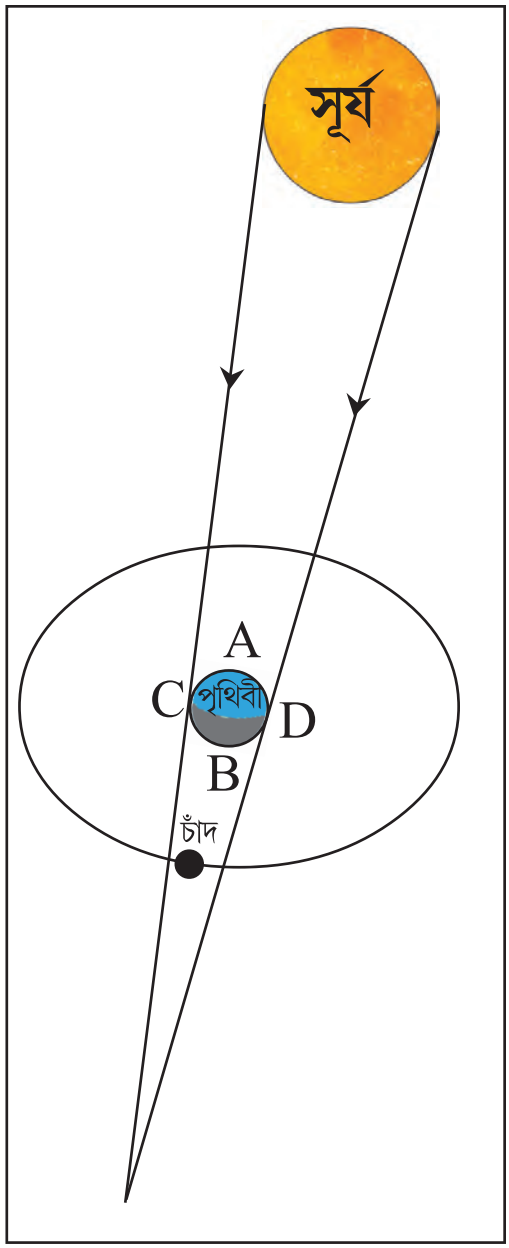


আশা বলল— চাঁদটা সরে গেলে চাঁদের ছায়া আর পৃথিবীতে পড়বেই না। তখন সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে না।

— ঠিক বলেছ। চাঁদটা পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে। পৃথিবীকে ২৯ দিন ১২ঘন্টায় ঘুরে আসে। মনে করো, এভাবে ঘুরতে ঘুরতে চাঁদটা পৃথিবীর যে দিকে সূর্য তার উলটোদিকে চলে গেল। তখন কী হবে?

— চাঁদের ছায়া পৃথিবীর উপর পড়বে না।

— পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপর পড়তে পারে কী?

সবাই খুব ভাবতে লাগল। একটু পরে আশা বলল— পড়তে পারে। তখন চাঁদ দেখা যাবে না। বুঝেছি, তখন চন্দ্রগ্রহণ হবে।

সাগিনা বলল— পুরো চাঁদটা ঢাকা পড়লে পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ। চাঁদের খানিকটা দেখা গেলে খণ্ডগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ।

তিতলি বলল — দিদি, আমি চন্দ্রগ্রহণ দেখেছি।

— সকলেই বোধহয় দেখেছ। কোন তিথিতে দেখেছ?

সবাই ভাবতে লাগল। ফুলমণি বলল - পূর্ণিমার রাতে দেখেছি।

— ঠিক বলেছ। কতক্ষণ ধরে গ্রহণ হলো?

— অনেকক্ষণ! প্রথমে চাঁদটার খানিকটা ঢেকে গেল। একসময় পুরোটা অন্ধকার হলো। খানিকক্ষণ অন্ধকার রইল। যেন অমাবস্যা। তারপর আবার একটু একটু করে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল চাঁদটা।

— এই তো বেশ মনে রেখেছ।

এই বলে দিদি সূর্য-পৃথিবী-চাঁদের ছবি আঁকলেন। তারপর বললেন

— চন্দ্রগ্রহণ দেখার সময় সূর্য-পৃথিবী-চাঁদ এইভাবে ছিল। তাই

পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপর পড়েছে। তুমি পৃথিবীর কোন জায়গায় ছিলে বলত? A বিন্দুর কাছে , নাকি B বিন্দুর কাছে?

আবার সবাই খুব ভাবতে লাগল। মনসুর বলল— A বিন্দুতে থাকলে সূর্য দেখা যাবে। তখন দিন। চাঁদ কীভাবে দেখব?

সাগিনা বলল — তাই তো। চন্দ্রগ্রহণ দেখার সময় নিশ্চয়ই B বিন্দুর কাছেই ছিলাম।

— B বিন্দু থেকে কিছুটা দূরে থাকলে কী দেখবে?

আবার সবাই একটু ভাবল।

একটু পরে মনসুর বলল— B বিন্দুর দু-পাশে যেখানেই থাকি না কেন, চাঁদকে ছায়ার মধ্যেই দেখব।

দিদি C বিন্দু আর D বিন্দু দেখালেন। তারপর বললেন — C বিন্দু আর D বিন্দুর মধ্যে থাকলেই পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ দেখবে।

## এঁকে দেখো লিখে ফেলো

নীচে সূর্য, পৃথিবী আর চাঁদের ছবি আছে। লাইন টেনে দেখো চন্দ্রগ্রহণ হবে কিনা। হলে, খণ্ডগ্রহণ নাকি পূর্ণগ্রহণ হবে? লেখো :




চন্দ্রগ্রহণ ☐ (হবে / হবে না)। গ্রহণ হবে ☐ (খণ্ডগ্রাস / পূর্ণগ্রাস)




চন্দ্রগ্রহণ ☐ (হবে / হবে না)। গ্রহণ হবে ☐ (খণ্ডগ্রাস / পূর্ণগ্রাস)




চন্দ্রগ্রহণ ☐ (হবে / হবে না)। গ্রহণ হবে ☐ (খণ্ডগ্রাস / পূর্ণগ্রাস)




চন্দ্রগ্রহণ ☐ (হবে / হবে না)। গ্রহণ হবে ☐ (খণ্ডগ্রাস / পূর্ণগ্রাস)

# পৃথিবী ও চাঁদের কক্ষপথ

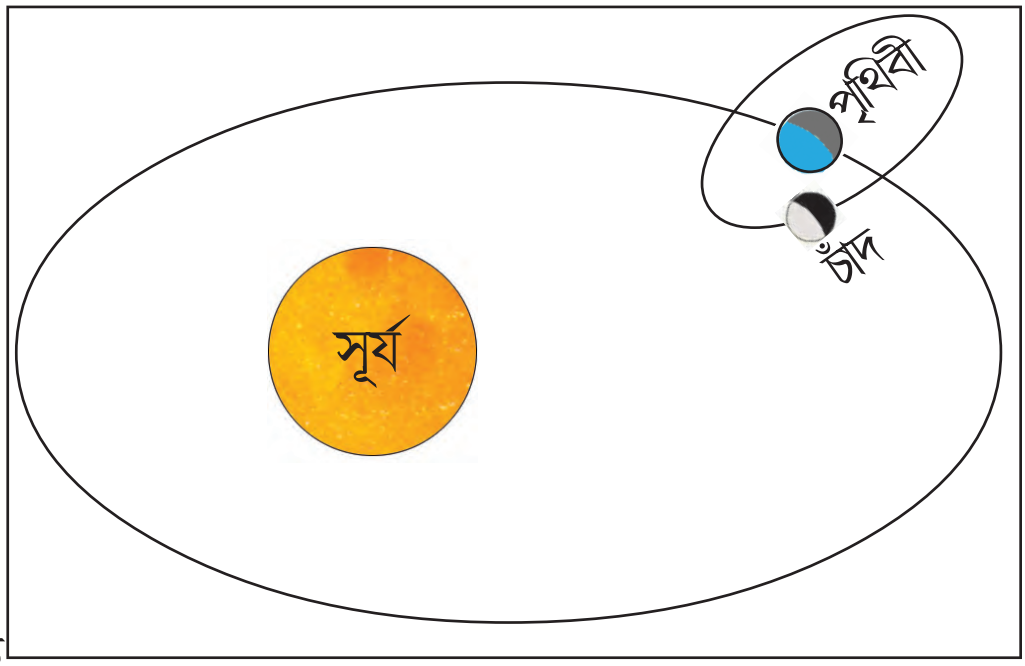


দুপুরে খাওয়ার পরে আশা বলল — কি অদ্ভুত ব্যাপার দেখ! পৃথিবী নিজের অক্ষে ঘুরছে। দিন- রাত্রি হচ্ছে। আবার চাঁদ ঘুরছে পৃথিবীর চারপাশে।

মুজিবর বলল — এত ঘোরাঘুরি বোঝা মুশকিল। পরের ক্লাসে দিদিমণির কাছে সবাই মিলে এটাই জানতে চাইল। দিদিমণি একটা ছবি দেখিয়ে বললেন — ছবিটায় সূর্য-পৃথিবী-চাঁদ ছাড়া আর কী দেখছ?

আশা বলল— পৃথিবী যে পথে সূর্যের চারদিকে ঘোরে। আর চাঁদ যে পথে পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে।

সাগিনা বলল— মানে, পৃথিবীর কক্ষপথ আর চাঁদের কক্ষপথ।

— ধরো, পৃথিবীর কক্ষপথটা সাইকেলের টায়ারের মতো। তবে টায়ারের মতো পুরোটা গোল নয়। অনেকটা উপরের ছবির মতো। তাহলে চাঁদেরটা কিসের মতো?

— আমরা যে রিং চালাই সেইরকম হতে পারে।

— ঠিক বলেছ। পৃথিবীটা টায়ার বরাবর সরে যাচ্ছে। তার সঙ্গে চাঁদের কক্ষপথটাও সরছে। আবার চাঁদটা নিজে সেই কক্ষপথে ঘুরছে। একটা টায়ার আর একটা রিং দিয়ে এমন বানাতে পারবে?

—আমার একটা টায়ার আছে। রিংও আছে। কিন্তু রিংটা টায়ারের মধ্যে যাবে কী করে?

মুজিবর বলল— তার দরকার নেই। একটা তার দিয়ে চাঁদের কক্ষপথটা করে নেব। তুই কাল টায়ারটা নিয়ে আসবি। আমি তার আনব। আর দু-খানা বল আনব। একটা পৃথিবী হবে, অন্যটা হবে চাঁদ ।

# পৃথিবী ও চাঁদের কক্ষপথ: টায়ার আর রিং নিয়ে পরীক্ষা

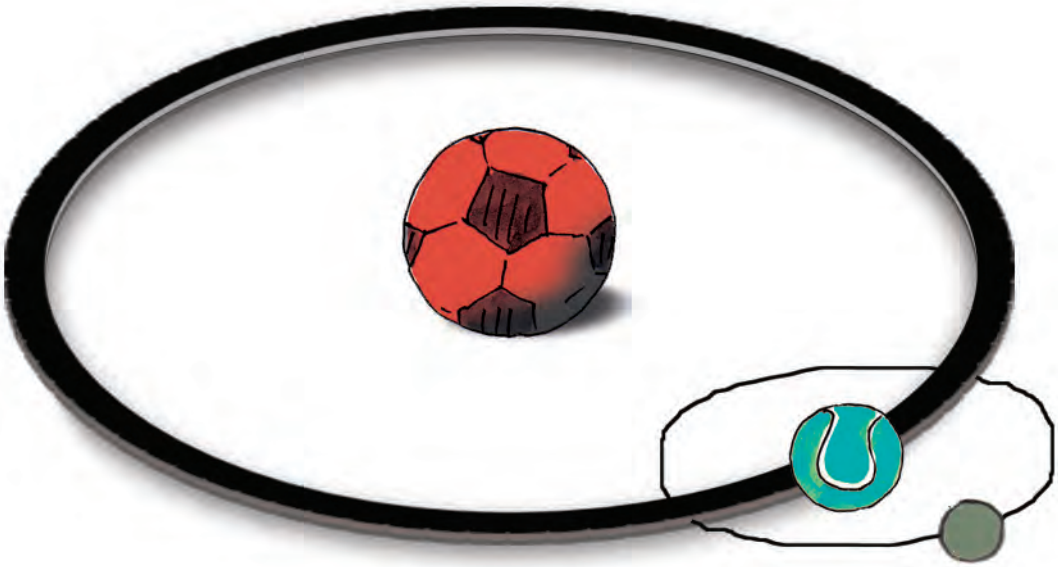

| | |
|---|---|
| বড়ো বল: সূর্য | ছোটো বল: চাঁদ |
| মাঝারি বল: পৃথিবী | গোল করে বাঁকানো তার: চাঁদের কক্ষপথ |
| টায়ার: পৃথিবীর কক্ষপথ | |

পরদিন। সাগিন আর মুজিবর সব গুছিয়ে রাখল। তার বাঁকিয়ে রিং করল। সেটা চাঁদের কক্ষপথ হলো। আশা বেশ বড়ো একটা ফুটবল এনেছে। সেটা সূর্য হলো। টেবিলে সব সাজিয়ে ফেলল। দিদিমণি ক্লাসে আসার আগেই সব তৈরি।

ব্যবস্থা দেখে দিদি খুব খুশি। বললেন — এসো তো। চাঁদটা কেমন ঘুরছে দেখাও।

মেরি আর সাগিন এগিয়ে এল। মাঝারি বলটা টায়ার বরাবর নিয়ে চলল সাগিন। ছোটো বলটা রিং বরাবর ঘোরাতে ঘোরাতে চলল মেরি। বলল — চাঁদ ঘুরছে পৃথিবীর চারপাশে।

দিদি বললেন — যে সময়ে চাঁদটা একপাক ঘুরে আসবে, সেই সময়ে পৃথিবী কতটা যাবে?

জন বলল — পৃথিবী পুরো পথ ঘুরবে বারো মাসে। চাঁদ ঘুরবে সাড়ে উনত্রিশ দিনে।

আশা বলল — তাহলে চাঁদ এক পাক ঘুরলে পৃথিবী ঘুরবে প্রায় বারো ভাগের এক ভাগ।

— এসো তোমরা দুজন। চাঁদ আর পৃথিবীকে তাদের কক্ষপথ ধরে সেইভাবে ঘোরাও।

জন আর আশা সেভাবে ঘোরাতে লাগল। চাঁদ বারো পাক ঘুরে গেল। তবু পৃথিবী পুরো একপাক ঘুরতে পারল না!

মুজিবর বলল — পৃথিবীও নিজের অক্ষের চারপাশে ঘুরবে। নইলে দিন-রাত্রি হবে কীভাবে?

— পৃথিবী নিজের অক্ষের চারপাশে ঘুরবে। আর একটু করে সরে যাবে। চাঁদটা পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে আসবে। তার মধ্যেই পৃথিবী নিজের অক্ষে উনত্রিশটা পাক খাবে। এসো তো দুজন। সেভাবে ঘোরাও দেখি।

একহাতে চাঁদের কক্ষপথ নিল মুজিবর। অন্য হাতে পৃথিবীটা ধরল। তার নিজের অক্ষে ঘোরাতে থাকল। এভাবে ধীরে ধীরে পৃথিবীর কক্ষপথ বরাবর চলল। চাঁদটা চাঁদের কক্ষপথ বরাবর ঘোরাতে ঘোরাতে চলল বীণা।

— এই তো বেশ হয়েছে। দুজন দুজন করে এসো। সবাই এভাবে ঘুরিয়ে বুঝে নাও।

## অনেকে মিলে সূর্যের চারপাশে চাঁদ ও পৃথিবী ঘোরার পরীক্ষাটা করো। টায়ার ইত্যাদির বদলে অন্য জিনিস নিতে পারো। পরীক্ষা করার পর সে বিষয়ে লেখো:

কোথায় পরীক্ষা করেছ: তারিখ: সময়:

সঙ্গে কারা ছিল:

তুমি কী কী জিনিস জোগাড় করেছিলে:

পরীক্ষা করার সময় তুমি কী ঘুরিয়েছ:

সঙ্গে কে ছিল: সে কী ঘুরিয়েছে:

সবমিলিয়ে কী কী জিনিস ব্যবহার করা হয়েছিল:

প্রথমে সেগুলো যেভাবে সাজানো ছিল তার ছবি আঁকো:

কোনটা কীসের বদলে ব্যবহার করেছ

কাজটা করার সময় কী কী অসুবিধা হয়েছে:

অন্য জিনিস নিলে সুবিধা হতো কিনা সে বিষয়ে কী মনে হয়েছে:

আর যা বলতে চাও:

কাজটা করে কী কী বুঝেছ:

# জোয়ারভাটা

সবাই একবার করে সূর্যের চারদিকে পৃথিবী আর চাঁদের ঘোরা দেখানোর পরীক্ষা করল। পৃথিবী আর চাঁদ কোথায় থাকলে অমাবস্যা আর পূর্ণিমা হয় তা বুঝে নিল সবাই।

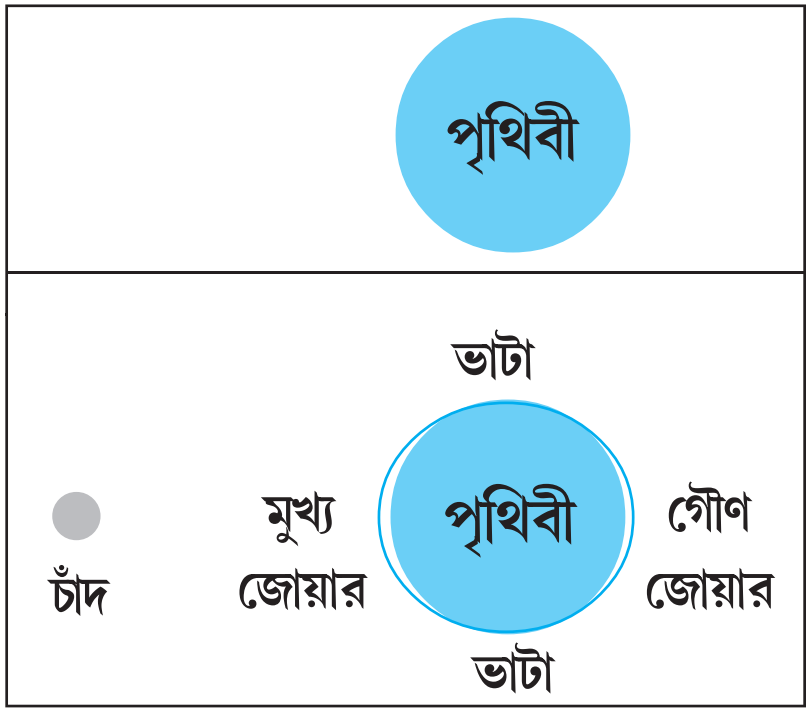


দেখেশুনে পুলক বলল — অমাবস্যা আরপূর্ণিমার দিন সমুদ্রে ও নদীতে জল খুব বাড়ে। সেটাই জোয়ার।

রাবেয়া বলল — জোয়ার কী?

— জানিস না? সমুদ্রের কাছে নদীতে জল বাড়ে। রোজই জোয়ার হয়। পরে জল কমে যায়। তাকে বলে ভাটা।

আলি বলল — কিছু নদীতে এমনিতে জল থাকে না। জোয়ারে জল আসে। তখনই নৌকা চলে। লোক যাতায়াত করে।

রাবেয়া বলল – যখন-তখন জল বেড়ে যায়? আবার কমে যায়?

— না, না। প্রায় সাড়ে বারো ঘন্টা অন্তর বাড়ে। একবার বেশি জোরালো। একবার কম জোরালো।

পরদিন ওদের কথা শুনে দিদি বললেন— চাঁদের আকর্ষণের জন্যই এমন হয়। তবে পৃথিবীর ঘূর্ণনেরও একটা ভূমিকা আছে। মুখ্য জোয়ারের মূল কারণ চাঁদের আকর্ষণ। আর গৌণ জোয়ারের মূল কারণ পৃথিবীর ঘূর্ণন।

একথা বলে দিদি একটা ছবি আঁকলেন। বললেন— পৃথিবীর যে দিকটা চাঁদের সামনে সেদিকের জল যেমন বাড়ে, পিছনের দিকের জলও বাড়ে। ফলে সেখানেও জোয়ার হয়।।

— সামনেও জোয়ার, পিছনেও জোয়ার?

--- সামনে বেশি জোরালো। সেটা মুখ্য জোয়ার। পিছনেরটা কম জোরালো। তাই সেটা গৌণ জোয়ার। দুয়ের মাঝের জায়গায় ভাটা।

পুলক বলল— বাড়ার সওয়া ছ-ঘন্টা পরে কমে। তখন ভাটা।

## বলাবলি করে লেখো

জোয়ারভাটা বিষয়ে আলোচনা করো। বড়োদের কাছে জেনে নাও। তারপর লেখো :

| | |
|---|---|
| জোয়ারভাটা হয় এমন পাঁচটা নদীর নাম | |
| নদীগুলো রাজ্যের কোনদিকে অবস্থিত | |
| জোয়ারভাটা হয় না এমন পাঁচটা নদীর নাম | |
| মুখ্য জোয়ারের কত সময় পরে ভাটা হয় | |
| মুখ্য জোয়ারের কত পরে গৌণ জোয়ার হয় | |
| আজ দুপুর একটায় মুখ্য জোয়ার হলে কাল ক-টায় মুখ্য জোয়ার হতে পারে | |

# কেন সাড়ে বারো ঘণ্টা

বিশু ভাবল, পৃথিবীর যেদিকটা যখন চাঁদের সামনে তখন সেখানে মুখ্য জোয়ার। উলটো দিকে গৌণ জোয়ার। পৃথিবী এক পাক ঘোরে ২৪ঘণ্টায়। তাহলে ১২ঘণ্টা পরে পিছনটা সামনে আসবে। পরের জোয়ার হতে প্রায় সাড়ে বারো ঘণ্টা লাগে কেন? দিদির কাছে এটা জানতে চাইল।

দিদি বললেন — সেই সময়ে চাঁদও একটু সরে যায়।

কেউই ভালো বুঝতে পারল না। তা দেখে দিদি একটা ঘড়ি আঁকলেন। বারোটা বাজে। ঘণ্টার কাঁটার উপর মিনিটের কাঁটা।

তারপর বললেন — আবার কখন দুটো কাঁটা এভাবে একসঙ্গে দেখা যাবে?

বিশু বলল — একটার কিছু পরে।

— একটায় নয় কেন?

আলি বলল — একটায় মিনিটের কাঁটাটা এক পাক ঘুরে আসবে। কিন্তু ঘন্টার কাঁটাও যে এগিয়ে যাবে।

— ঠিক এইরকম। চাঁদ আর পৃথিবী একই দিকে ঘোরে। পৃথিবী ১২ঘণ্টায় আধ পাক ঘুরল। ততক্ষণে চাঁদও এগিয়ে গেছে। তাই চাঁদের সামনে যেতে পৃথিবীর আরো প্রায় ২৬মিনিট লেগে যায়। গৌণ জোয়ারের ১২ঘণ্টা ২৬মিনিট পরে মুখ্য জোয়ার হয়।

পুলক বলল — অমাবস্যা-পূর্ণিমাতে জোয়ারের জল বেশি বাড়ে। কেন?

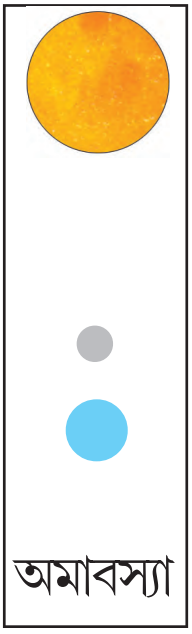


আলি বলল — তখন তো ভরা কোটাল।

— আর মরা কোটাল কোন সময়ে?

— সপ্তমী-অষ্টমীর সময়ে জোয়ারের জল বেশি ওঠে না। তখনকার জোয়ারকে বলে মরা কোটাল।

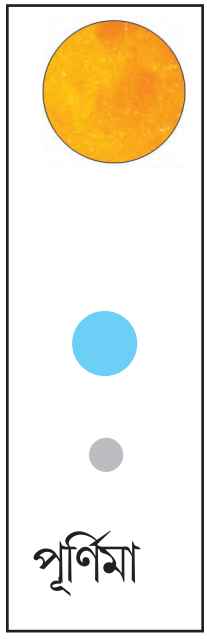


— ঠিক বলেছ। অমাবস্যায় পৃথিবীর একইদিকে সূর্য আর চাঁদ থাকে। পূর্ণিমা তারা থাকে বিপরীত দিকে। তাই ভরা কোটাল হয়। এসব নিয়ে পরে আরো ভালো করে বুঝবে।

## বলাবলি করে ঠিকটা বেছে নাও

মুখ্য জোয়ার, গৌণ জোয়ার, ভরা কোটাল, মরা কোটাল বিষয়ে পড়ো। বড়োদের কাছে জেনে নাও। নিজেরা আলোচনা করো। তারপর লেখো :

| | |
|---|---|
| জোয়ারের জল বেশি উঠবে | অমাবস্যার আগের দিন / পঞ্চমীর দিন / নবমীর দিন (ভুল দুটো কেটে দাও) |
| জোয়ারের জল সবচেয়ে বেশি উঠবে | যে-কোনো অমাবস্যার দিন/ সূর্যগ্রহণের দিন/ যে-কোনো পূর্ণিমার দিন (ভুল দুটো কেটে দাও) |
| জোয়ারের জল কম উঠবে | ভরা কোটালে / মরা কোটালে (ভুলটা কেটে দাও) |
| ১২টার পর ঘড়ির দুটো কাঁটা এক জায়গায় হবে | ১টায় / ১টা ৫মিনিটে/ ১টা ৫মিনিট ৩০সেকেন্ডে (ভুল দুটো কেটে দাও) |
| আজ সকাল ৯টায় মুখ্য জোয়ার হলে কাল মুখ্য জোয়ার হতে পারে | সকাল সাড়ে ১০টায়/ সকাল ৯টা ৫২মিনিটে/ রাত ১০টা ১৮মিনিটে/ রাত ১০টা ৫২মিনিটে (ভুলগুলো কেটে দাও) |

# সূর্যই সব শক্তির উৎস

সবাই ভাবল, সূর্যও সমুদ্রের জলকে টানে। বিশু বলল— মনে হয় গোটা পৃথিবীটাকেই টানে । চাঁদ যেমন টানে তেমনি।

পরদিন ক্লাসে দিদি বললেন- ঠিকই ভেবেছ। সূর্যও পৃথিবীকে টানে। তবে জোয়ারভাটায় চাঁদের টানের গুরুত্ব বেশি। চাঁদ পৃথিবীর অনেক কাছে আছে তো তাই।

আশা বলল— তারাগুলো পৃথিবীকে টানে না?

— সবাই সবাইকে টানে। তবে তারা বা নক্ষত্রগুলো বহু দূরে আছে। তাই টান কম।

— কত দূরে আছে? সূর্যের দ্বিগুণ?

— আরো অনেক বেশি। সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসে প্রায় ৮মিনিটে। সূর্যের পর সবচেয়ে কাছের নক্ষত্রের নাম প্রক্সিমা সেনটাউরি। সেখান থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে

৪বছরেরও বেশি সময় লাগে। এই বলে দিদি বোর্ডে দেখালেন সেটা কতগুণ সময়।

আলি বলল— অনেক! প্রায় ৩ লক্ষ গুণ! অন্য তারাগুলো এর থেকেও দূরে?

— হ্যাঁ, আরও বহু দূরে নক্ষত্র আছে।

বিশু বলল— সেজন্যই তারাদের এত ছোটো দেখায়! আসলে অত ছোটো নয়?

— ঠিক তাই। বহু নক্ষত্রই সূর্যের চেয়ে অনেক বড়ো। তবু তাদের বিশেষ কোনো প্রভাব পৃথিবীতে নেই। পৃথিবীর আলো-তাপ সবই সূর্য থেকে আসে। সূর্যই আমাদের সব শক্তির উৎস।

পুলক বলল— গাছের কাঠ পুড়িয়েও তাপ পাই। গাছ চাপা পড়ে কয়লা হয়েছে। কয়লা পুড়িয়ে তাপবিদ্যুৎ হয়। তাহলে কিছু শক্তি তো গাছ থেকেও পাই।

মেরি বলল— কিন্তু গাছের খাদ্য তৈরি করতে সূর্যের আলো লাগে! সূর্যের আলো ছাড়া গাছ বাড়ত না।

আশা বলল— গাছ জন্মাতই না! বীজ ফোটার তাপ কোথায় পাবে?

বিশু বলল— আর গাছ না থাকলে আমরাও থাকতাম না।

## বলাবলি করে লেখো

কোন কোন কাজ করার শক্তি সূর্য থেকে পাইনি বলে মনে হয়? সেগুলো নিয়ে নিজেরা আলোচনা করে লেখো:

| শক্তি বা কাজের নাম | আলোচনার সিদ্ধান্ত | কেন এমন সিদ্ধান্ত |
|---|---|---|
| | | |

# জীবজগৎ বাঁচিয়ে রাখব আমরা

একসঙ্গে কয়েকজন স্কুল থেকে ফিরছে। দিদিও আজ ওদের সঙ্গে। শনিবার, তাই ছুটি হয়েছে তাড়াতাড়ি। বড্ড গরম। পুলক বলল— সূর্য চিরকাল এভাবে শক্তি ছড়িয়ে চলেছে?

— চিরকাল ঠিক বলা যাবে না। প্রায় ৫০০ কোটি বছর আগে সূর্যের জন্ম। তখন থেকেই শক্তি ছড়াচ্ছে। সেই শক্তির অল্প একটা অংশ পৃথিবীতে আসে।

— সূর্য কী এভাবে শক্তি ছড়িয়েই যাবে?

— এখনও প্রায় ৫০০ কোটি বছর ছড়াবে। তারপর একসময় সূর্যের জ্বালানি শেষ হয়ে যাবে।

আশা বলল— তখন পৃথিবীর কী হবে? আমাদের কী হবে?

দিদি হেসে বললেন— সে অনেক দেরি! ৫০০ কোটি বছর মানে বুঝেছ? এই ৫০০ কোটি বছরের মধ্যে কত কিছু হয়েছে!

আলি বলল— এর মধ্যে কী কী হয়েছে?

— ডাইনোসরের নাম শুনেছ?

— হ্যাঁ দিদি। টিভিতে দেখেছি। তারা ধ্বংস হয়ে গেছে।

— তারা যখন এসেছিল আমরা ছিলাম না। কয়লা, পেট্রোলিয়াম এল কোথা থেকে? বড়ো বড়ো বন আর প্রাণীদের দেহ মাটির তলায় চাপা পড়েছে। সেখান থেকেই এগুলো এসেছে। আবার নতুন উদ্ভিদ আর প্রাণীরা এসেছে।

— জীবজগৎ যাতে ধ্বংস না হয় তার জন্য কী করা যায়?

— সেই চেষ্টাই করছি আমরা। অবশ্য পুরোটা আমাদের হাতে নেই। পৃথিবীর পরিবেশটা বুঝতে হবে। যাতে নিজেদের দোষে জীবজগতের ক্ষতি না হয় তা দেখতে হবে।

— কিন্তু অনেক কিছু আমাদের জানা নেই। কতরকমের প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়!

— সেসব জানার জন্যই গবেষণা। তোমরাও অনেক গবেষণা করবে। জীবজগৎ টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করবে।

বলাবলি করে লেখো, আঁকো

ডাইনোসরদের সম্পর্কে বড়োদের কাছে জেনে আলোচনা করো, লেখো, আঁকো:

| নানারকম ডাইনোসরের নাম লেখো | মাংসাশী ডাইনোসর কারা | ডাইনোসরের ছবি আঁকো |
|---|---|---|
| | | |

## আকাশে কত তারা

পরদিন আলি বলল — অন্য তারাও কি সূর্যের মতো? একসময় জন্মেছে। এখন আলো দিচ্ছে। কিন্তু চিরকাল থাকবে না।

দিদি বললেন--- সব নক্ষত্রেরই জন্ম-মৃত্যু আছে। অনেকটা সূর্যের মতনই।

আশা বলল — আকাশে কত নক্ষত্র আছে?

— খালি চোখে কয়েক হাজার নক্ষত্র দেখা যায়। তবে আসলে নক্ষত্রের সংখ্যা অনেক বেশি।

— হয়তো একটা নক্ষত্রের মৃত্যু হলো। তাতে পৃথিবীর কোনো ক্ষতি হবে না?

— না, তাতে পৃথিবীর উপর কোনো প্রভাব পড়বে না। তবে হঠাৎ কোনো নক্ষত্র আমাদের কাছাকাছি এসে পড়লে মুশকিল।

দয়াল বলল — নক্ষত্র পৃথিবীর উপর এসে পড়তে পারে?

— নক্ষত্র পৃথিবীর উপর পড়বে না। তবে অন্য কিছু পড়তে পারে। ১৯৯৪ সালে বৃহস্পতি গ্রহের উপর একটা ধূমকেতু এসে পড়েছিল। ফলে বৃহস্পতির গায়ে অনেক বড়ো বড়ো গর্ত হয়েছে।

— ধূমকেতু কি উল্কার মতো? পৃথিবী আর চাঁদের উপর যেমন উল্কা পড়েছে তেমনি?

— অনেকটা তাই। ধূমকেতু আসলে বরফ জমা পাহাড়ের মতো।